অভিশপ্ত জাতি

(ক্রুসেড, আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ, কনস্টান্টিনোপল বিজয়,
মোঘল আগ্রাসন, ব্যাংকিং ব্যবসা, উপনিবেশবাদ)

ড. আলি তানতাবি

অনুবাদ
আব্দুল আহাদ তাওহীদ

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

অভিশপ্ত জাতি

ড. আলি তানতাবি

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল: ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৫১-৩১৫৩৯০

www.facebook.com/pothikprokashon

Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২২ ইং

২১ শে বইমেলা পরিবেশক : প্রীতম প্রকাশ

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com

wafilife.com

pothikshop.com

hoqueshop.com

islamicboighor.com

bookriver.com

ruhamashop.com

raiyaanshop.com

মূল্য: ২০০/-

ভূমিকা

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার। যিনি একক, অদ্বিতীয়। শান্তি বর্ষিত হোক রণাঙ্গনের সাহসী যোদ্ধা, রাষ্ট্রনায়ক, মুসলিম উম্মাহর ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। উম্মাহর প্রতি যাঁর ছিল অগাধ প্রেম-ভালোবাসা। রহমত ও শান্তির মেঘমালা ব্যাপ্ত করে নিক তাঁদেরকে, পিচ্ছিল পথে যাঁরা ছিলেন তাঁর উত্তম সহচর। জান্নাতের উচ্চাসনে স্থান করে নিক তারা, যারা ইসলামি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রবের রাহে জীবন বিলীন করে দিয়েছেন, ইসলামি আন্দোলন করতে গিয়ে যাদেরকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছিল। ছেড়ে দিতে হয়েছিল আপন মাতৃভূমি। জালিম শাসকের চোখে চোখ রেখে কথা বলার অপরাধে যাদেরকে বন্দীশালায় জীবন কাটাতে হচ্ছে। যারা ইসলামি শাসন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমৃত্যু সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন। কোনো রক্ত চক্ষুকে পরোয়া করেননি যারা। আমরা তাদের ভুলে যাইনি। তারা হলেন আমাদের অগ্রগামী। আমরা তাদের কাতারে শামিল হব ইনশাআল্লাহ!

পরসমাচার,

আনুষ্ঠানিকভাবে যদিও ১৯৪৭ সালে ইহুদি জাতির অনুপ্রবেশ ঘটে ফিলিস্তিনের ভূখন্ডে। কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে ১৯১৭ মতান্তরে ১৯৩৫ সালে ফিলিস্তিন ভূখন্ডের কয়েকটি শহর ইহুদিদের দখলে ছিল, যা বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে ১৯৪৭ সালে। এর আগে আরেকটু কথা বলি! বিধর্মীরা, বিশেষতঃ ইহুদি ও খৃস্টানরা 'জাতীয়তাবাদ ও সেকুল্যারিজম' নামক ধ্বংসাত্মক বীজ আমাদের মনমস্তিষ্কে বপন করে দিয়েছে। যার ফলে মুসলিমরা বিভিন্ন পতাকা নিয়ে ছত্রভঙ্গ এবং ইসলামি বিধি-নিষেধকে ঘরোয়া বানিয়ে ফেলেছে। ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত ইসলামকে ফলো করতে হবে; এটি এখন কারো কারো নিকট অলীক রূপকথা। ফলে মুসলিমদের একদলই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের স্লোগান নিয়ে সর্বপ্রথম মাঠে অবতীর্ণ হয়। ইসলামে এসবের স্থান নেই। সমগ্র ভূমি হলো একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার। সমগ্র পৃথিবীতে কুরআনের শাসন থাকবে। মুসলমানদের কর্তৃত্ব চলবে।

ইহুদিরা সকল অনিষ্টের মূল। ইসলামি খিলাফতের সর্বশেষ খলিফা আব্দুল হামিদের নিকট তাদের একটি দল আগমন করে বলেছিল—'আপনি আমাদেরকে ফিলিস্তিনে বসবাসের জন্য কিছু ভূখণ্ড দিন।' তিনি বললেন, 'মুসলিম ভূখন্ডের

এক ইঞ্চিও আমার নয়। বরং তা পুরো মুসলিম উম্মাহর।' এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, পূর্ববর্তী শাসকরা নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের উপর অটল-অবিচল ছিলেন। জীবন চলে যেতে পারে, আদর্শ থেকে মুহূর্তের জন্যেও পিছ পা হননি তারা। বর্তমান শাসকগণ নাচের পুতুল। নিজের ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ করে সব বিলিয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে আধুনিক ব্যাংক ব্যবসা সুদি কারবার জার্মান ইহুদি রথসচাইল্ড-এর হাত ধরেই আমাদের নিকট এসেছে। যার মূল থিম হলো, ধনীরা পর্যায়ক্রমে আরও ধনী হবে। আর দরিদ্ররা হতদরিদ্র হবে। তারা দাজ্জাল আসার পথকে সুগম করে দিচ্ছে।

বর্তমান এ বিশ্ব শাসন করছে আমেরিকা। যদিও পরোক্ষভাবে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের হাতে। শীঘ্রই নেতৃত্বের আসনে ইহুদিরা বসতে যাচ্ছে। তখন বুঝে নিতে হবে দাজ্জালের আগমন খুবই নিকটবর্তী এবং 'মালহামা' শীঘ্রই সংঘটিত হতে যাচ্ছে।

প্রিয় পাঠক! আরবি ভাষায় লিখিত ড. আলি তানতাবি রাহিমাহুল্লাহ-এর قصتنا مع اليهود ইতিহাস বিষয়ক বইটি অতি সংক্ষিপ্ত হলেও এতে রয়েছে অজানা ইতিহাস, মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব এবং বিবেককে জাগ্রত করে সামনের পথে এগিয়ে যাওয়ার কলাকৌশল। লেখকের ভাষা ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। যেমন বলা যায়—'কারামার যুদ্ধ, ইস্তিফাদা' এভাবে অনেক বড় যুদ্ধ বা ইতিহাসকে তিনি এক শব্দে নিয়ে এসেছেন। এতে পাঠকের মূল বিষয়টি বুঝতে বেগ পেতে হবে বিধায় আমি এর সাথে সংশ্লিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা যুক্ত করেছি। কিছু আলোচনা শিরোনাম ভিত্তিক দিয়েছি। আর কিছু আলোচনা ফুটনোট হিসেবে যুক্ত করেছি। যাতে বইটি বিশেষ এক মহলে সমাদৃত না হয়ে সর্বমহলে সমাদৃত হয়। লেখকের বইটি শুধুমাত্র তাদের জন্য, যাদের ইতোপূর্বে ফিলিস্তিন ও ইসরাঈল-এর ইতিহাস সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা রয়েছে। যাদের এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, তারা লেখকের বইটি পড়ে কিছু বুঝবে বলে আমার মনে হয় না। বিধায় আমার এ প্রচেষ্টা। তথ্যপঞ্জি হিসেবে আমি লেখাগুলো নিয়েছি 'রক্তের আঁকরে লেখা ফিলিস্তিন ও দৈনিক নয়া দিগন্ত' পত্রিকা থেকে। আশা করি পাঠক বইটি শুরু থেকে শেষ অবধি অধ্যয়ন করার মাধ্যমে ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করে মুসলমানদের করণীয় কী সে বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান লাভ করবে ইনশা আল্লাহ।

আব্দুল আহাদ তাওহীদ
২৩.১২.২০২১

সূচিপত্র

মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব ৯
ইসলাম অনন্য ১০
মোঘল আগ্রাসন ১১
দুঃখ-দুর্দশা মুসলিম উম্মাহর চিরসঙ্গী? ১২
মুসলিম ভূখণ্ডগুলো ইহুদিদের পদানত ১৩
ইহুদি জাতি ১৪
আসলে কি ওরা নির্যাতিত? নিপতিত? ১৫
১৯৪৮ সালের যুদ্ধ : মুসলিম নিধন ও ইসরাঈলি রাষ্ট্রের জন্ম ১৭
গভীর ষড়যন্ত্রে মত্ত ওরা ২২
আমাদের ভাবনা : হৃদয়ের গহিনে ওদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ২৩
মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ : হাতের মুঠোয় পৃথিবী ২৪
পরাজয় : সে তো বিজয়েরই একটি অংশ ২৬
ফিলিস্তিনিদের আর্তনাদ ২৮
ব্যাংকিং ব্যবসা ৩৪
সমরকৌশল ৩৫
আল্লাহর সাহায্যের হাতছানি ৪৩
একটি উপমা ৪৪
ইকরা ৪৫
৬ দিনের যুদ্ধ : ১৯৬৭ ..... ৪৫
মুসলিম বিশ্বকে খণ্ডিত করার বৃটিশ ষড়যন্ত্র ৪৬
প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা ৪৭
আমাদের সংবিধান হবে আল-কুরআন ৪৮

অভিশপ্ত ইহুদি জাতি সম্পর্কিত ৪০টি হাদিস

ইহুদিরা সবসময় আল্লাহর বিধান নিয়ে ঠাট্টা করত ৫৩
নবিজি সম্পর্কে তাওরাতেও সুসংবাদ ছিল—কিন্তু সেটাকে ওরা গোপন করেছিল ৫৩
সত্যটা জানার পরেও ওরা নবিজির উপর ঈমান আনেনি ৫৪
ওরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে গোপনে মশকারিও করত .৫৭
ওরা নবিজির মরণ কামনা করত ৫৭
মুসলমানের উপর হিংসা করত ৫৮
ওরা তাওরাতের সত্য বিধানকে লুকিয়ে রাখত ৫৮
ইহুদিরা ছিল অন্ধ পূজারী ৫৯
ওদের বিধানও আল্লাহ কঠিন করে দিয়েছিল ৬০
একবার ইহুদিরা অবাক হয়ে গিয়েছিল ৬০
প্রতিটি শিশুকে তার পিতা-মাতা অমুসলিম বানায় ৬২
ইহুদিদের ব্যাপারে নবিজির ভবিষ্যতবাণী ৬৩
ওদেরকে বিশ্বাস করতে নেই ৬৩
নবিজিকে হত্যার চক্রান্ত করেছিল ওরা ৬৪
ওদের বিশ্বাস করা হতো না ৬৫
ওরা আল্লাহর বিধান নিয়েও চক্রান্ত করত, গরিবদের উপর জুলুম করত ৬৬
ওরা প্রিয়তম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য যাদু করেছিল ৬৭
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওরা হত্যা করার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেনি ৬৮
যে কারণে ওরা ধ্বংস হয়েছে ৬৯
ইহুদিদের উলঙ্গপনা ৭০
ওরা ছিল নিকৃষ্ট জাতি ৭১
ইহুদিরা তাদের নবিদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছিল ৭২
শনিবার ইহুদিদের ধ্বংসের কারণ ছিল ৭২
ইহুদিরা হারামের ব্যাপারে কৌশল করার চেষ্টা করত ৭৩
একজন ইহুদি একটি বালিকাকে হত্যা করেছিল ৭৩
ইহুদিরা মুসা নবিকে বলেছিল—আপনি এবং আপনার রব গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা পারবো না ৭৪
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের জন্য বদদুআ করতেন ৭৫

ওদেরকে সম্মান করতে নেই ৭৬
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আদেশ করা হয়েছিল ৭৬
ইহুদিরা ছিল জমিন চোর ৭৭
ওদেরকে আরব থেকে বিদায় করতে হবে ৭৯
ইহুদিরা অভিশপ্ত জাতি ৭৯
ইহুদিরা নারীদেরকে কষ্ট দিত ৮০
ইহুদিরা দাজ্জালের অনুসারী হবে ৮১
ইহুদিদের সাথে মুসলমানের যুদ্ধ হবে ৮২
ইহুদি ও খৃস্টানরা জাহান্নামী ৮৩

মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব

এ জাতি তার দীর্ঘ ইতিহাসে জয় পরাজয়, সোনালি অতীত, হতাশা নিরাশা ও কণ্টকাকীর্ণ বিপর্যয়ের মুহূর্তগুলো যুগ যুগ ধরে প্রত্যক্ষ করে আসছে, যা প্রতিটি জাতিই দেখেছে। তবে ইতিপূর্বে মানুষ প্রতিপক্ষ থেকে যে পরিমাণ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণে বর্তমানে উম্মতে মুহাম্মাদ প্রতিপক্ষ ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাদের ষড়যন্ত্র অধিক গুরুতর ও প্রকট। নিশ্চয় উম্মতে মুহাম্মাদের শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে বর্তমানে গভীর প্রোপাগান্ডায় লিপ্ত রয়েছে তাদেরকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য। তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে, যা মুসলমানদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও মনমস্তিষ্কে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। তারা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করছে। বিধর্মীরা শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে যাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার শক্তি-সামর্থ ও অস্ত্র, সৈন্য আপাতত কোনো রাষ্ট্রের নেই। এবং বহু শক্তিশালী রাষ্ট্র তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করেছে। বিশেষতঃ ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা, ইতালি প্রভৃত রাষ্ট্রগুলো ইসরাঈলকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে আসছে। অতএব এত বাঁধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা বিজয়ের ব্যাপারে হতাশ হব না। নিরাশায় ছেয়ে যাব না। দুর্গম পথ মাড়িয়ে হলেও আমাদেরকে মানযিলে মাকসাদে পৌঁছতেই হবে। বিজয় আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। কেননা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য অভিন্ন পথ পন্থা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, ঐ সমস্ত নিয়ম, যেগুলো আল্লাহ তাআলা অস্তিত্বশীল বস্তুর জন্য প্রণয়ন করেছেন। অর্থাৎ এমন নিয়ম কানুন, যেগুলোকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলে জানি। যেখানে স্থান ও সময়ের ভিন্নতা কোনো প্রভাব ফেলে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, মহাকর্ষ আইন; আল্লাহ তাআলা বিশ্ব চলাচল ও সৃষ্টির জন্য যা নির্ধারণ করেছেন। সাম্প্রতিককালে যা নিউটন আবিষ্কার করেছে।

আর এই শক্তি সেসব দেশে ছড়িয়ে পড়ছে, যেসব দেশে নিরক্ষরেখা (নিরক্ষবৃত্ত, বিষুবরেখা) অধিক তাপমাত্রার কারণে প্রজ্জ্বলিত হয় এবং ছড়িয়ে পড়ছে দুই মেরুর ঐসব পাহাড়ে, যেগুলোর চূড়া বরফাবৃত। এখন তা ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। যেমন, কয়েক শতাব্দী পূর্বে হয়েছিল। এখন শতাব্দীর পর শতাব্দী তা অব্যাহত থাকবে। এ তো হল অমুসলিমদের একটি আবিষ্কার।

উত্তম বিষয় হচ্ছে তাকওয়া। বাতিলকে আক্রমণ করার একমাত্র শক্তি। তবে চিরসত্য কথা হল, বিজয় সত্যের পক্ষেই থাকবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলাম অনন্য

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন আরবের একটি দল মুরতাদ হয়ে যায়। তারা ইসলামের মহান বিধান যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসে। মানুষের ভাবনা হল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে ইসলাম হয়ত এখানেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলাম তো বিলীন হওয়ার নয়। বরং এক বীর বাহাদুর (আবু বকর রা.) ইসলামের ঝাণ্ডা উত্তীন করে হুংকার দিলেন এবং মুহাম্মাদের তরবারি দ্বারা অস্বীকারকারীদের শিরা-উপশিরায় আঘাত করতে লাগলেন। ফলে সকল মুরতাদ ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসল। এবং ইসলাম পূর্ব থেকে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল।

একসময় পুরো ইউরোপ আমাদেরই ছিল। ক্রুসেডার যোদ্ধাদের একটি অংশ কনষ্টান্টিনোপলে[১] (ইস্তাম্বুল) ছিল। আরেকটি অংশ ইউরোপে ছিল। তারা একের

---

[১] 'কনস্টান্টিনোপল' বা 'কস্তুনিয়া' বর্তমান 'ইস্তাম্বুল' শহরটি ছিল রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী। এর পতনের ফলে রোম সাম্রাজ্যের দেড় হাজার বছরের ইতিহাসের চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটে। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ কর্তৃক বিজয়ের প্রাক্কালে (১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে) এটি ছিল (পূর্ব) বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী। একসময় শহরটি ল্যাতিন ও গ্রিক সাম্রাজ্যেরও রাজধানী ছিল। পরবর্তীতে এটি উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। ৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে বাইজেন্টিয়ামের সম্রাট কনস্টান্টাইন শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে তার রাজধানী স্থাপন করেন। প্রতিরক্ষাগত দিক থেকে এটি ছিল ইউরোপের সবচেয়ে মজবুত দুর্গবেষ্টিত শহর। যার তিনদিকে দেয়াল দিয়ে সুরক্ষিত এবং একদিকে সমুদ্র ছিল। কনস্টান্টাইনের নামে শহরটির নাম হয় 'কনস্টান্টিনোপল' বা 'কস্তুনিয়া'। ১২ শতকে এ শহরটি ইউরোপের সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা ধনী শহর ছিল। ১৪৫৩ সালের ২৯ মে উসমানি বাহিনী কর্তৃক 'কনস্টান্টিনোপল' বিজয়কে ১৫০০ বছরের মতো টিকে থাকা রোমান সাম্রাজ্যের সমাপ্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উসমানিয়দের এ বিজয়ের ফলে তাদের সামনে ইউরোপে অগ্রসর হওয়ার পথের সমস্ত বাধা অপসারিত হয়। খ্রিষ্টানজগতে এ পতন ছিল বিরাট ধাক্কার মতো। বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মাদ তাঁর রাজধানী এড্রিনোপল থেকে সরিয়ে 'কনস্টান্টিনোপলে' নিয়ে আসেন। 'কনস্টান্টিনোপল' বিজয়ের ফলে দীর্ঘ অজ্ঞতা ও মূর্খতা থেকে ইউরোপে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শহরটি বিজয়ের চেষ্টা চলছিল। যদিও অনেক পরে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহর হাতে এই সফলতা ধরা দেয়। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী মোতাবেক 'কনস্টান্টিনোপল' দুইবার বিজিত হবে। এর মধ্যে প্রথমবার সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহর হাতে বিজিত হয়েছে এবং শেষবার ইমাম মাহদির আগমনের পর মুজাহিদিনদের হাতে এ শহরটি অধিকৃত হবে।

পর এক হামলা, আক্রমণ, প্রচারভিযান করতে থাকল। বিপদাপদ, দুর্যোগ তীব্র থেকে আরও তীব্রতর হয়ে উঠল। সিরিয়ায় তাদের একটি শাসিত রাষ্ট্র গঠিত হল। তারা বাইতুল মাকদিসে নব্বই বছরেরও বেশি বসবাস করে আসছিল। অতঃপর আল্লাহ সত্যের বিজয় দান করলেন।

মোঘল আগ্রাসন

যেদিন পূর্ব দিক থেকে মোঘল রাজ বংশের[১] উত্থান ঘটল। যেভাবে পশ্চিম দিক থেকে ক্রুসেডার যোদ্ধাদের আগমন ঘটেছিল। যারা রাষ্ট্রের শিকড় উপড়ে ফেলেছিল। সেদিন পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোতে তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। বিশেষতঃ বাগদাদ। তৎকালীন সময়ে যেখানে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের বসবাস

---

[২] মোঘল আগ্রাসন ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে তমশাচ্ছন্ন যুগ। ১৩শ শতকের মতো ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ মুসলিম বিশ্ব এর আগে-পরে আর দেখেনি। মোঘলরা ছিল মধ্য ও উত্তর এশিয়ার যাযাবর জাতি। ধূ ধূ বৃক্ষহীন প্রান্তরে বাস করতো তারা। প্রতিনিয়ত স্থান পরিবর্তন ও যাযাবরবৃত্তি ছিল তাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়। তাদের ধর্মবিশ্বাস ছিল বস্তুকেন্দ্রিক বহু ঈশ্বরবাদ। সুবৃহৎ ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা তারা কখনোই গড়ে তুলতে পারেনি। উত্তর চিনের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে নামেমাত্র সন্ধিচুক্তি ও জোটস্থাপন ছিল মোঙ্গলদের রাষ্ট্রব্যবস্থা। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সবসময় সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতো। মোঘল ও অন্যান্য আক্রমনকারীদের থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষার্থে চৈনিক সম্রাট শি হুয়াং (২৪৭-২২১ খ্রিষ্টপূর্ব) চিনের বিখ্যাত 'দ্য গ্রেট ওয়াল' নির্মাণ করেন। চেঙ্গিস খান ছিল ১২০৬ থেকে ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোঘলদের গোত্রপতি। তার শাসনকালে যে মোঘল গোত্রসমূহকে অন্যান্য তুর্কি গোত্রের সঙ্গে ঐকবদ্ধ করতে সমর্থ হয়। এর মাধ্যমে এক সুবৃহৎ ও ঐক্যবদ্ধ দল গড়ে উঠে যাদের হাতে বর্বরতার নতুন এক ইতিহাস সূচিত হয়। মোঙ্গলদের বিজয়ের মূল সূত্র ছিল আতঙ্ক সৃষ্টি। যেসব শহরের অধিবাসীরা মোঙ্গলদের নিকট আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানাতো, তাদের উপর তারা নির্মম গণহত্যা চালাতো। আফগানিস্তানের হেরাত অবরোধ করার পর মোঘলরা প্রায় ১৬ লাখ মানুষকে হত্যা করে। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে মোঘল বাহিনী বাগদাদ অবরোধ করে। অবরোধের দুই সপ্তাহ পর ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখে তারা শহরে প্রবেশ করে। এরপর পুরো এক সপ্তাহ লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। মসজিদ, হাসপাতাল, লাইব্রেরিসহ সবকিছু ধ্বংস করা হয়। বাগদাদের কুতুবখানাগুলোর বইয়ের কালিতে টাইগ্রিস নদীর পানি কালো রঙ ধারণ করে। ধ্বংসযজ্ঞের এক সপ্তাহে ১০ লাখ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। বাগদাদ বসবাসের অযোগ্য ও সম্পূর্ণ জনমানবহীন শহরে পরিণত হয়।

বাগদাদের পর মোঘলরা সিরিয়া ও মিসরের কিছু অংশ দখল করে নেয়। দৃশ্যত তাদের মোকাবিলা করার মতো কোনো শক্তি তখন মুসলিম বিশ্বের ছিল না। কিন্তু মামলুক সুলতানদের সঙ্গে আইনে জালুতে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মোঙ্গলবাহিনীর বিজয়যাত্রা থেমে যায় এবং হালাকুর প্রেতাত্মারা চিরতরে মুসলিম বিশ্ব থেকে বিতাড়িত হয়।

ছিল। আর বাগদাদ ছিল পৃথিবীর রাজধানী। সেখানে বিশাল একটি গ্রন্থাগার ছিল। মানুষ সেখানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করত। দলবেঁধে উচ্চশিক্ষা অর্জন করার জন্য মানুষ ভিড় জমাত সেখানে। কিন্তু ভাগ্যের চরম পরিহাস! দজলা নদীতে লক্ষাধিক বইয়ের সমাগম ঘটল। তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে লাইব্রেরির সকল বইকে দজলা নদীতে ভাসিয়ে দিল। আর লক্ষাধিক বইয়ের কালি পানির সাথে মিশে একাকার হওয়ায় পানিসহ নদীর চারপাশ কালো রং ধারণ করল। কিন্তু যুগ যুগ ধরে মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্কে লালিত নববী জ্ঞান চিরতরে মিটিয়ে দেয়া যায় কি? না! না! তা তো হতে পারে না।

দুঃখ-দুর্দশা মুসলিম উম্মাহর চিরসঙ্গী?

সর্বযুগে হতাশা-নিরাশা, দুর্যোগ, হীনতা মুসলমানদের পিছু লেগেই ছিল। বাজ পাখির ন্যায় তাদের ঘাড়ে এ সমস্ত বিপদাপদ চেপে বসেছে। কিন্তু এসব কিছু মুসলমানদের বিন্দুমাত্র কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। তবে পরস্পর কোন্দল, আবার কারো বিশ্বাসঘাতকতা, চাটুকারিতা তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিজয় হাতছানি দিয়েও দিচ্ছে না। কিন্তু একনিষ্ঠ মুমিন বান্দারা তো সকল ঘাত-প্রতিঘাত ছিন্ন করে শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাতে তাদের হৃদয় মোটেও প্রকম্পিত হয়ে উঠে না। অস্ত্র তাদের হাতের নাগালেই রয়েছে। ফলশ্রুতিতে শত্রু মোকাবিলা করতে এ অস্ত্র কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। মুসলমানরা জানে কিভাবে পিদিম দ্বারা পুরো বিশ্ব আলোকিত করে দিতে হয়। আর পিদিম তো অস্ত্রের সহায়ক। ফলে এ অস্ত্রের মাধ্যমেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে আলোর দিশা পাওয়া যায়। আর মুসলিম উম্মাহর পিদিম তো হল ঐশী গ্রন্থ আল কুরআন। আর মুমিনের হৃদয়ই তো হল প্রকৃত অস্ত্র। বিচক্ষণ যোদ্ধারা জানে কিভাবে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হয়। তারা এর মাধ্যমে রবের ভালোবাসা পাওয়ার আশা করে। দুনিয়ায় তাদের কোনো প্রাপ্তি নেই এবং উপনিবেশবাদের[৩] উপার্জনের পরিসমাপ্তিও তাদের উদ্দেশ্য নয়।

---

[৩] উপনিবেশ এমন একটি স্থান বা এলাকা, যা অন্য কোনো দেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। সহজ কথায় অন্য দেশের দখলদারি ও কর্তৃত্বের শিকার হওয়াকে বলে উপনিবেশ। একটি দেশের যখন অনেকগুলো উপনিবেশ থাকে তখন মূল দেশটি সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত হয়। বিশ্বে একসময় অনেক উপনিবেশ ছিল, যা বর্তমানে স্বাধীন দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ দেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের দখলদারিত্বে ছিল। 'উপনিবেশ' বা 'কলোনি' ল্যাটিন শব্দ 'কলোনিয়া' থেকে নির্গত। প্রাচীন গ্রিসে উপনিবেশের নিয়ন্ত্রককে মেট্রোপোলিশ বা প্রধান নগর বলা হতো। একটি উপনিবেশকে প্রায়শ নির্দিষ্ট কোনো না কোনো দেশ কর্তৃক শাসন করা হতো। নিয়ন্ত্রিত

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

'মুমিনের জন্য (সমগ্র) পৃথিবী কারাগারস্বরূপ। আর কাফেরদের জন্য জান্নাতস্বরূপ।'[৪]

তবে ইমাম মাহদি আলাইহিস সালামের আগমনের মাধ্যমে পুরো পৃথিবী খেলাফতের অধিকৃত হবে। আর বিজয় মুসলমানদেরই হবে।

মুসলিম ভূখণ্ডগুলো ইহুদিদের পদানত

আমি তো এতদিন নিদ্রায় বিভোর ছিলাম। খ্রিষ্টিয় শতাব্দির ১ম যুগে মায়াজালে ঘেরা পৃথিবীর দিকে চোখ খুলে তাকালাম। দেখতে পেলাম... মুসলমানদের একটি ভূখণ্ডও নেই। পৃথিবীতে এমন কোনো ভূখণ্ড নেই, যা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত অথবা সে-ই ভূখণ্ডও নেই, যার চতুর্পাশে উপনিবেশবাদের সীমানা রয়েছে। তবে মুসলমানদের পদানত করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা একটি ভূখণ্ড (জাযিরাতুল আরব) রক্ষা করেছেন। হে দূরদূরান্ত থেকে আগত সৈন্যরা! কোথায় তোমরা! আসো! এ ভূখন্ডের উপর বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে দাও। শৈশবে আমার ধারণা ছিল, সবচেয়ে কষ্টসাধ্য অনমনীয় বিষয় হল স্বদেশ থেকে উপনিবেশ স্থাপনকারীদের চিরতরে বিতাড়িত করা। অতএব আল্লাহ তাআলা এ কঠিন বিষয়কে সহজ করে দিক। অসম্ভবকে সম্ভব করে দিক এবং দেশকে পুনরুদ্ধার করে তার অধিবাসীর কাছে ফিরিয়ে দিক।

আমরা কোনো প্রকার কষ্ট-ক্লান্তি ছাড়া এমনি-এমনিই স্বাধীনতা অর্জন করিনি। এর জন্য আমরা বহু আনন্দ বিসর্জন দিয়েছি। জীবন উৎসর্গ করেছি। সেদিন তাজা প্রাণগুলো নিমিষেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। আমরা লড়াই করেছি। রক্ত ঝরিয়েছি। ফলে রক্তের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল যুদ্ধের প্রান্তর। শত্রুর বিরুদ্ধে কঠিন

রাজ্যরূপে উপনিবেশের আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্ব করার কোনো স্বাধীন সত্ত্বা বা অধিকার ছিল না। ষোড়শ শতকের শুরুতে আধুনিক ভারতের অংশবিশেষ পর্তুগালের দখলদারিতে ছিল; যা সমষ্টিগতভাবে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত পর্তুগিজ ইন্ডিয়া নামে পরিচিতি ছিল। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত বাংলা ও ভারতবর্ষ বৃটিশের শোষণের শিকার হয়।

[৪] আস সহিহ, ইমাম মুসলিম: ২৯৫৬।

সংগ্রাম গড়ে তুলতে আমরা মোটেও কার্পণ্য করেনি। মনোবল হারিয়ে ফেলিনি। হীনমন্যতায় ভুগিনি যে, আমাদের সৈন্য সংখ্যা কম, অস্ত্র সীমিত। আমরা প্রত্যেকেই সাধ্যানুযায়ী স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছি। সীমাহীন এ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন একটি ভূখণ্ড।

মহাযুদ্ধের অবসান ঘটল। এখন যদি আমরা নির্যাতিত হই, নিপতিত হই, তাহলে তো আমাদের বর্তমান অবস্থা পূর্বের অবস্থা থেকে আরও শোচনীয় হয়ে পড়বে। আর আমরা তো এখন মানুষের দুর্ব্যবহার, হিংস্র আচরণ ও বিদ্বেষ প্রবণতার শিকার হব এবং অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠী দ্বারা নির্যাতিত ও শাসিত হব।

ইহুদি জাতি

যারা অনুসরণ করেনি মুসা আলাইহিস সালামের এবং ঈমান আনেনি তাঁর প্রতি। বরং তারা অস্বীকার করেছে মুসা আলাইহিস সালাম আর অবিশ্বাস করেছে ঈসা আলাইহিস সালামকে। যেভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কুফুরি করতে তাদের হৃদয় ক্ষণিকের জন্যও কেঁপে উঠেনি। তারা নিজ ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলেছে। আল্লাহর দেয়া প্রদত্ত কিতাবে বিকৃতি সাধন করেছে। তারা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। যাদের পথ ও পন্থা ভিন্ন ভিন্ন। তারা সীমালঙ্ঘনের সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছে। মানুষের প্রতি অবিচার, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা তাদের নিত্তনৈমত্তিক কর্মে পরিণত হয়েছে।

অনুরূপভাবে যুগ যুগ ধরে পরবর্তী প্রজন্মরাও তাদের এ ধারা অব্যাহত রেখেছে। যে রাষ্ট্রেই তাদের নিবাস ছিল সেখানে থেকে তারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হত, প্রোপাগান্ডা চালাত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক আসলে বাজ পাখির ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স তাদেরকে আধুনিক অস্ত্র BLC 15 পাউন্ডার, অর্ডনেন্স QF 17 পাউন্ডার, ড্রাগন ফায়ার, গ্রেনেড লঞ্চার, বিক্রিয়া মডেল 35, QF 2 পাউন্ডার, মেশিনগান, এ জাতীয় অত্যাধুনিক অস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রতিনিয়ত সরবরাহ করত এবং বর্তমানেও করে তাদের অস্ত্র ব্যবসা জমজমাট রাখছে। যা দিয়ে তারা মুহূর্তেই প্রতিপক্ষকে মাটির সাথে ধুলিস্যাত করে দেয় এবং ভূখন্ডের পর ভূখণ্ড দখল করে নেয়। তারা অতি নগন্য ক্ষুদ্র বিষয় নিয়েই বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। তাদের সামনে কোনো বিধান উপস্থাপন করা হলেই তারা তাতে মতানৈক্য করে বসে। এ রাষ্ট্রের জন্মই হয় অবৈধভাবে। এ রাষ্ট্রের অধিবাসীরা বিকৃত ও কুৎসিৎ স্বভাবের হয়ে থাকে। সে-ই রাষ্ট্রের নাম হল ইসরাঈল। তৎকালীন দুটি দেশ ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য

উঠে পড়ে লেগেছিল। এক. আমেরিকা। দুই. রাশিয়া। আর মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দেয় তুরস্ক। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনকারীর মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলিম দেশ হল ইরান। এ অবৈধ রাষ্ট্রটি জন্ম লাভের একদিন অতিবাহিত হতে না হতেই তৎকালীন দুটি রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আরবের বুকে রাষ্ট্র গঠন করার জন্য তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। আর অপরদিকে পর্যায়ক্রমে মুসলিম উম্মাহর উপর তাদের অসহনীয় আগ্রাসন দিন দিন বেড়েই চলছিল। ফলে মুসলমানরা ইহুদিদের দ্বারা নির্যাতিত, নিষ্পেষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

কবি বলেন,

'আমি যদি হাশেমী বংশের কোনো লোক দ্বারা নির্যাতিত হই, বনু আব্দিল মুত্তালিব যাকে সমর্থন করে।

আমার সমস্ত পরিকল্পনা আমার জন্য লাঞ্ছনাকর। কিন্তু হে আমার বন্ধুরা! তোমরা এসে দেখে যাও, তারা আমার সাথে কিরূপ আচরণ করছে!'

আসলে কি ওরা নির্যাতিত? নিপতিত?

একসময় ইহুদিরা নির্যাতিত নিপীড়িত ছিল। তাদের প্রতি অবিচার করা হত। প্রচণ্ড কষ্ট দেয়া হত। আর হিটলার অনন্তকালের জন্য তাদের চাষাবাদ করা জমি কেড়ে নিয়েছিল এবং চিরদিনের জন্য সবুজ শ্যামলে ঘেরা ভূমি দখল করে নিয়েছিল এবং তা রাষ্ট্রের সম্পদ বলে প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল। পরবর্তীতে তাদের সন্তান সন্ততিদেরকেও হিটলার হত্যা করেছিল। পৃথিবীর পরাশক্তিদের হৃদয়ে তাদের প্রতি মায়া-ভালোবাসার উদ্রেক সৃষ্টি হল। তারা তাদের ব্যথায় ব্যথিত হল। তখন তারা তাদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার দৃঢ় সংকল্প করে। তারা মুসলমানদের ভূখন্ডে একটি রাষ্ট্র গঠন করার ঘোষণা দিল। যেমন কথা তেমন কাজ! এরপর তারা মুসলমানদেরকে তাদের বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্রে চলে যেতে বাধ্য করল। যারা তাদের কথায় সম্মত প্রকাশ করেনি তাদেরকে পাখির মতো গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করা হল। রাষ্ট্রের উৎকৃষ্ট সম্পদ রেখে যাওয়ার জন্য তাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করা হল। এরপর নাগরিক মন্ত্রী (যারা বাঘের চামড়ার উপর হরিণের চামড়া পরিধান করেছে) এসে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, তিনি তাদের জন্য মুসলিম দেশ ফিলিস্তিনের কেন্দ্রবিন্দুতে বসবাস করার জন্য একটি আবাসস্থল গড়ে দেবেন। অন্য কেউ যার মালিকানা দাবি করতে পারবে না। অথচ মন্ত্রী তাদেরকে এক ইঞ্চি ভূমি দেয়ারও অধিকার রাখে না। অতএব এমন ঘৃণ্য কাজ মানব ইতিহাসে তাদের

জন্য কলঙ্ক হয়ে থাকবে। এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কোথাও সংঘটিত হয়নি। আশা করি ভবিষ্যতেও হবে না। এরপর মুসলিম উম্মাহ যখন আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিল তখন এরা ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে শান্তির পথে ফিরে আসার আহবান জানায়। এরা বলে, শান্তি কি তোমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না? তাহলে কেন তোমরা রক্তের বন্যা বয়ে দিচ্ছ এবং অনায়েশেই প্রাণগুলোকে নিমিষেই হত্যা করছ?

তাদের শান্তির নিবাসের দিকে আমন্ত্রণের দৃষ্টান্ত হল, ধরুন! ডাকাত আপনার বাসায় ঢুকে আপনার পরিবারের সদস্যদেরকে হত্যা করেছে। আপনার মূল্যবান জিনিস পত্রগুলো লুট করে নিয়ে গেছে। আপনি নিরুপায়! তাদেরকে দু'চারটি কথা বলার দুঃসাহস অন্তত আপনার নেই। বিধায় তারা আপনার বাসাকে নিজের বাসা মনে করে কিছুদিন অবস্থানও করেছে। এখন আপনার পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছে। এরপর আপনি যখন তাদেরকে বাসা থেকে বের করার ব্যাপারে মনস্থ হলেন তখন তারা বলল, দেখো! দেখো! এ তো সন্ত্রাস। আমাদের বাসা থেকে আমাদেরকেই তাড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদেরকে আবার তাদের সাথে যুদ্ধ করার আহবান করছে।

তারা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের জন্য সকলকে আমন্ত্রন জানাল।

আমরা বললাম, আমরা আমাদের ভূখণ্ড রক্ষা করতে এসেছি। এ ভূখণ্ড রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য। যারা অন্যায়ভাবে আমাদের ভূখণ্ড দখল করে বসে আছে এদের ব্যাপারে যারা নিশ্চুপ তারা কি আমেরিকাকে খুশি করতে চায়? না ইংল্যান্ডকে?

আচ্ছা ধরুন তো! ওয়াশিংটন বা লন্ডনের একখন্ড ভূমি যদি কেউ দখল করে, এরপর তার অধিবাসীদেরকে হত্যা করে সেখানে তান্ডব চালায়, লুণ্ঠন করে এবং তাদের পিছনে হিংস্র প্রাণীকুকুর বা বাঘ লেলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি দেয়, অতঃপর বলে, কেন এত লড়াই?

এসো...আমরা একটা সমাধানে পৌঁছাই। তাহলে কি তাদের এ কথা ধর্তব্য হবে?

১৯৪৮ সালের যুদ্ধ : মুসলিম নিধন ও ইসরাঈলি রাষ্ট্রের জন্ম

আমরা ১৯৪৮ সালে ইসরাঈলের[৫] বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু তাদের বিপক্ষে বিজয়ী হওয়া আমাদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। কেননা ইতিমধ্যেই

---

[৫] বৃটিশরা ইহুদিদের জন্য একদিকে ফিলিস্তিনের দরজা খুলে দেয়, অন্যদিকে বৃটিশ বাহিনীর সহযোগিতায় ইহুদি সন্ত্রাসীরা পুরোদমে সামরিক প্রস্তুতিও নিতে শুরু করে। গোপনে প্রস্তুত হয় অনেকগুলো প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসী সংগঠন। এর মধ্যে তিনটি প্রধান সংগঠন হল- 'হাগানাহ, ইরগুন ও স্টার্ন গ্যাং।' হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ এবং ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টির মাধ্যমে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের নিজ আবাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করতে থাকে এই সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো। জায়নবাদী সন্ত্রাসীদের গণহত্যার কথা আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারিত হলে পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য ইহুদিদের গুপ্তসংগঠন 'হাগানাহ' বেছে নেয় আত্মহননের পথ। ১৯৪০ সালে হাইফা বন্দরে এসএস প্যাট্রিয়া নামের একটি জাহাজকে উড়িয়ে দিয়ে ২৭৬ জন ইহুদিকে হত্যা করে হাগানাহ। ১৯৪২ সালে আরেকটি জাহাজ ধ্বংস করে ৭৬৯ জন ইহুদিকে একই কায়দায় হত্যা করে সন্ত্রাসী গ্যাংটি। উভয় জাহাজে ইহুদিরা ফিলিস্তিনে আসছিল। বৃটিশরা সামরিক কৌশলগত কারণে জাহাজ দুটিকে ফিলিস্তিনের বন্দরে ভিড়তে দিচ্ছিল না। হাগানাহ নিজ জাতির লোকদের হত্যা করে বিশ্বজনমত পক্ষে আনার চেষ্টা চালায়। এর সঙ্গে ইহুদি বসতি নির্মাণ ও মুসলিমদেরকে ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদকরণও চলতে থাকে সমানতালে। ফলে অল্পসময়ে ২০ হাজার থেকে বহিরাগত ইহুদির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫ লাখ ৪০ হাজারে।

১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে ইঙ্গ-মার্কিন চাপে জাতিসংঘে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়। ৩৩টি রাষ্ট্র পক্ষে, ১৩টি বিরুদ্ধে এবং ১০টি ভোট দানে বিরত থাকে। প্রস্তাব অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হয়েও ইহুদিরা পায় ভূমির ৫৭%, ফিলিস্তিনিরা পায় ৪৩%। প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিম সীমানা অনির্ধারিত রাখা হয়। যাতে ভবিষ্যতে ইহুদিরা সীমানা বাড়াতে পারে।

১৯৪৮ সালের ১৪ মে বৃটিশ সরকার ফিলিস্তিনে দখলদারিত্বের অবসান ঘটিয়ে সৈন্যদের বের করে নিলে সেদিনই তেলআবিব শহরে ইহুদি জাতীয় পরিষদ গঠিত হয় এবং ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়। পূর্ব যোগাযোগ অনুসারে মাত্র ১০ মিনিটের ব্যবধানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুম্যান নব্য ইসরাঈল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়। এরপর স্বীকৃতি দেয় বৃটিশ ও সোভিয়েত রাশিয়া। বৃটিশরা ফিলিস্তিন ত্যাগ করার প্রাক্কালে তাদের যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও আনুষাঙ্গিক অবকাঠামো ইহুদি জায়নবাদিদের হাতে তুলে দিয়ে যায়। ফলে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইহুদিদের আগ্রাসন ঠেকানোর যাবতীয় প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে পড়ে।

১৯৪৮ সালের যুদ্ধে দশ লাখের অধিক ফিলিস্তিনি মুসলমান বাস্তুহারা হয়। এ সময় জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে আরব ও ইহুদি অঞ্চলে ভাগ করে জেরুসালেম আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে নিলে ইসরাঈল এ পরিকল্পনা মানতে অস্বীকৃতি জানায়।

তারা বহুশক্তি-সামর্থ অর্জন করে ফেলেছে। তারা আমাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পরবর্তীতে তারা আমাদেরকে যুদ্ধ বিরতি করতে বাধ্য করে। যার ফলে এ যুদ্ধ বিরতির মাধ্যমে তারা আমাদের হাতকে অবশ করে দিয়েছিল এবং যুদ্ধ বিরতি আমাদের শত্রুদেরকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল। বিপরীত দিক থেকে আমাদের শক্তি ও অভিজ্ঞতার খুবই অভাব ছিল। ফলে আমরা প্রতারিত হয়েছি এবং আমাদের বিশ্বাস ভঙ্গ হয়েছে। তখন ইহুদিরা আমাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। এবং আমাদের কাপুরুষতায় আঘাত হেনেছে।

আর কাপুরুষরা সকল শক্তি সামর্থ একত্রিত করেও যদি প্রতিপক্ষ শিবিরে একটি আঘাত হানে, তাহলে পরেরবার সে আর পাল্টা আঘাত হানতে পারে না। ভীতু বা কাপুরুষেরা রাতের অন্ধকারে প্রতিপক্ষের উপর হামলে পড়ে। প্রতিপক্ষ যদি এখন তার এ হামলাকে রুখে দিয়ে পাল্টা আক্রমন করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার মৃত্যু হবে নিশ্চিত। অন্যথায় তার মুক্তি হবে।

আর এখন তো রাতের পরিসমাপ্তি ঘটল। গাফিল জাগ্রত হল। শিশুরা বড় হল এবং যুদ্ধের ময়দানে তাদের আগমন সময়ের দাবী হয়ে দাঁড়াল। তোমরা কি মহাসড়কের কিনারে দুর্বল ঝোপঝাড়গুলোকে দেখতে পাচ্ছ, যেগুলোর প্রতি তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে লোহার খাঁচায় আটকে রেখেছে। অতএব এটা কি তাদের কাছে শৃঙ্খলার মতো? এখন যদি বৃক্ষগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং নিজের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়, তাহলে তো আর খাঁচার প্রয়োজন নেই। ...কেননা তার শিকড়ই বেষ্টনি হিসেবে তার চতুর্দিকে থাকবে।

অতএব, আজ আমরা সেই বৃক্ষের ন্যায়, যে-ই বৃক্ষ পূর্ব থেকে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আর এক সময় তো আমরা নরম ডালের ন্যায় ছিলাম, যাকে সাপোর্ট ও ঠেস দেয়ার প্রয়োজন ছিল অন্যদের। ...

সকল বিষয় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে শুরু করেছে। কুয়াশা কিছুটা কেটে গেছে। ফলে মানুষের সামনে বাস্তবতা প্রকাশিত হল। তা কেবল রমজানের যুদ্ধ[৬]

১৯৬৪ সালের ২৮ মে আল-কুদস শহরে ফিলিস্তিনি কংগ্রেস বসে। এই কংগ্রেসে ফিলিস্তিন মুক্তিসংস্থা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়। গঠিত হয় ফিলিস্তিন মুক্তিবাহিনী 'পিএলও'। পরবর্তীতে ইয়াসির আরাফাতের আল-ফাতাহ 'পিএও-ই' যোগ দিলে এটি হয়ে উঠে তার সামরিক বাহিনী।

[৬] ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে মিসরের সামরিক বাহিনী অতর্কিত সুয়েজ খাল অতিক্রম করে অলঙ্ঘনীয় বলে খ্যাত ইসরাঈলের বারলেভ প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙে ফেলে এবং সিনাই মরুভূমি ও দখলকৃত ইসরাঈলি ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে। পূর্বদিক থেকে একই সময় সিরিয় বিমানবাহিনী ইসরাঈলের উপর হামলা চালায়। যুদ্ধের প্রথম কয়েকদিনে ইহুদিবাদের শত শত জঙ্গিবিমান ও

দ্বারাই সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ অক্টোবর বা নভেম্বরের যুদ্ধ। ঐ যুদ্ধের পর ইহুদিরা নিজেদের দৃষ্টিতেই হীন হয়ে পড়েছিল এবং এ ইন্তিফাদার[৭] পর তারা

সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়। নিহত হয় কয়েক হাজার ইসরাঈলি। শূন্যে মিলিয়ে যায় ইসরাঈলের অপরাজেয় হওয়ার জপকথা। যুদ্ধের পরবর্তী দিনগুলোতে ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাদের দ্রুত সামরিক সহায়তা ও সরাসরি অংশগ্রহণ এবং সিরিয় সেনাবাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধের গতি ইহুদিদের পক্ষে মোড় নেয়। অন্যান্য আরব দেশ এই যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা না রাখায় মিসর নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। ইসরাঈলি সামরিক বাহিনী হেলিবোর্ডের মাধ্যমে সুয়েজ খালের পশ্চিমে মিসরের অভ্যন্তরের একটি ছোট্ট এলাকায় সৈন্য নামিয়ে তা অবরোধ করতে সক্ষম হয়। অবশেষে ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় কায়রো থেকে ৬০১ কিলোমিটার দূরত্বে যুদ্ধাবসানের জন্য আলোচনা শুরু হয় এবং সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান ঘটে।

রমজানের যুদ্ধ ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদীদের দখলদারী প্রতিষ্ঠার পর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। দুই পক্ষের সমরাস্ত্র, লজিস্টিক ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে এর আন্দাজ করা হয়। ১৯ দিন ব্যাপী স্থায়ী এ যুদ্ধে তিন হাজারের অধিক ইহুদি সন্ত্রাসী নিহত হয়। আহত হয় ৯ হাজারের মতো। জায়নবাদীদের প্রায় ১০৬৩টি ট্যাঙ্ক, ৪০৭টি সাঁজোয়া, ৩৮৭টি জঙ্গিবিমান ও এয়ারক্রাফট ধ্বংস হয়। ভিন্ন দিকে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের নিহত সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। ৩৪১টি এয়ারক্রাফট ও ১৯টি নেভাল ভ্যাসেলসহ ধ্বংস হয় ২২৫০টি ট্যাঙ্ক। সমরশক্তির দিক থেকে শুধু মিসরই ইসরাঈল থেকে প্রায় দুই গুণ ছিল। সিরিয়া ও অন্যান্য আরব দেশের হিশেব করলে জায়নবাদীদের সঙ্গে তাদের সামরিক সক্ষমতার অনুপাত দাঁড়ায় ৩:১।

[৭] ইন্তেফাদা; বিপ্লবের নয়া তরিকা। সাইয়্যেদ জামালুদ্দীন আফগানির প্রচেষ্টায় মুসলিম দেশগুলোতে যে জাগরণ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তা মিসরে মুহাম্মাদ আবদুহু ও সাইয়্যেদ কুতুবের মাধ্যমে নতুনত্ব লাভ করে। এই জাগরণ আন্দোলনের পরোক্ষ ফলাফল আল্লামা ইকবালের মতো মনীষীদের মাধ্যমে পাক-ভারতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন, আলজেরিয়াতে ১৯৬২ সালের বিপ্লব প্রভৃতি।

মুসলিম বিশ্বের আত্মমর্যাদাহীন সরকারগুলো মুসলমানদেরকেই স্বৈরাচার বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও ইসলামি জাগরণের তাত্ত্বিক দিকটিকে ম্লান করে দেখতে বাধ্য করেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে 'আরব জাতীয়তাবাদ'কে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হচ্ছিল, যার প্রধান চিন্তক ছিল খ্রিষ্ট-ধর্মাবলম্বী মাইকেল আফলাক (সিরিয়া ও ইরাকের ব্যর্থ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এবং সাদ্দাম ও হাফেজ আসাদের তাত্ত্বিক গুরু)। ফিলিস্তিনের জনগণ মুসলমান হলেও তাদের সংঘবদ্ধ ও সংহত হওয়ার সূত্রটি ইসলাম ছিল না, ছিল আরব জাতীয়তাবাদ। এ কারণে ফিলিস্তিনিরা ইসলামি, খ্রিষ্টীয় ও সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন মতাদর্শ নিয়ে কাজ করতো। কিন্তু এগুলো তাদেরকে তাওহিদ-বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ জিহাদে উজ্জীবিত করতে পারেনি। ইরানের শিয়ারা শাহের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রশিক্ষণ নিতো ফিলিস্তিনি শিবিরগুলো থেকে। ফলে ফিলিস্তিনি গেরিলা গ্রুপগুলোর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। ১৯৭৮ সালে ইরানে শিয়া বিপ্লবের গতিধারা তুঙ্গে উঠলে 'আজ ইরান কাল ফিলিস্তিন' শ্লোগান ফিলিস্তিনিদের কিছুটা আশান্বিত করে। কিন্তু শিয়া বিপ্লবকেন্দ্রিক সমস্ত আশা ফিলিস্তিনিদের জন্য গুড়েবালি হয়ে থেকেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে প্রাচ্যোন্মুখ ও প্রগতিশীল দেশগুলো বাহ্যত ফিলিস্তিনি গেরিলা গ্রুপগুলোর পৃষ্ঠপোষক ছিল। এসব পৃষ্ঠপোষকতার কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও

তাদের কাছে আরও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্রে পরিণত হল। বিশ্বের কাছে তাদের অবস্থা দাঁড়াল বেলুনের ন্যায়, যা দিয়ে শিশুরা শৈশবে খেলা করে।

প্রতিযোগিতা। এই দেশগুলোর কোনো একটিও ইসরাঈলের অস্তিত্ব বিরোধী ছিল না। জায়নবাদীদেরকে তারা বরং বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহায়তা দিয়েছে।

১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে আম্মানে অনুষ্ঠিত আরব শীর্ষ সম্মেলনে জায়নবাদী ইহুদিদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নূন্যতম নীতি অবস্থানও গ্রহণ করা হয়নি। সম্মেলনের সব মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল ইরান-ইরাকের যুদ্ধের দিকে এবং সামগ্রিকভাবে এ সম্মেলন ক্যাম্প ডেভিড লাইন ধরে এগিয়ে যায়। এদিকে ফিলিস্তিনি জাতি বছরের পর বছর অপেক্ষা করছিল আরবজগত তাদেরকে বাস্তহারা অবস্থা থেকে নাজাত দেবে। বিশেষত অধিকৃত ফিলিস্তিনে বসবাসরত ফিলিস্তিনি জনগণ তাকিয়ে ছিল আরব সরকারগুলোর দিকে।

ফিলিস্তিনের মজলুম জাতি তাদের গেরিলা গ্রুপগুলোর ভোগ-বিলাস, বিভেদ, অনৈক্য ও দলাদলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং ফিলিস্তিনি জনতার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার প্রতি আরব সরকারগুলোর প্রকাশ্য উদাসীনতা ও অবহেলা প্রত্যক্ষ করে আরব জাতীয়তাবাদী চিন্তা-দর্শনের কার্যকারিতা এবং সরকারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন সম্পর্কে আরেকবার সব আশা-ভরসার অবসান ঘটায়। ১৯৮৭ সালের হেমন্তে অধিকৃত ফিলিস্তিনের সাধারণ জনতা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের সূচনা ঘটায়, যার নাম দেয়া হয় ইন্তিফাদা। ইন্তিফাদার অর্থ 'আন্দোলন করা, নাড়া দেয়া'। ইন্তিফাদার পূর্বপর্যন্ত তামাম আন্দোলন ও অভ্যুত্থান ছিল বিশেষ কোনো দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন 'ফাতাহ আন্দোলন'। এটি ১৯৮৩ সালের মে মাসে আরাফাতের নেতৃত্বাধীন আল-ফাতাহ থেকে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু এবার (১৯৮৭) এই ইন্তিফাদার আগে বা পরে কোনো বিশেষণ যুক্ত হয়নি। এই ইন্তিফাদা মূলত গণপ্রতিবাদ বা গণঅভ্যুত্থান। ফিলিস্তিনে জায়নবাদীদের দখলদারীর প্রতিবাদে সংঘটিত এই ইন্তিফাদার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল-

ক. বিস্মৃতির আস্তাকুঁড় থেকে ফিলিস্তিন ইস্যুকে বের করা।

খ. বিশ্ব জনমতের দৃষ্টি আকর্ষণ।

গ. এ অঞ্চলে ইসলামি আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে ইন্তিফাদাকে সমন্বিত করা, যা ইন্তিফাদার চেহারার সবিশেষ রূপ দান করে।

ঘ. ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানকে জরুরী পরিকল্পনা হিসেবে উপস্থাপন।

ঙ. ফিলিস্তিন ইস্যুর সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপকে ঘনিষ্ঠ করা।

চ. আমেরিকা ও ইহুদিদের মনে ইসরাঈলের রাজনৈতিক শুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা।

ছ. জায়নবাদীদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে হুমকিযুক্ত করা।

জ. ফিলিস্তিনি গেরিলা দলগুলোর অভ্যন্তরীন কোন্দল ও মতভেদকে ম্লান করে আরব সরকার ও আন্তর্জাতিক সমাজকে জনমতের অনুসারী করা, যারা এতোদিন নিজ নিজ স্বার্থে ফিলিস্তিন ইস্যুকে ব্যবহার করে আসছিল।

জবরদখল ও জায়নবাদীদের সরকার প্রতিষ্ঠার চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় পর ইন্তিফাদার ফলে প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনি জনগণ আক্রমণাত্মক অবস্থানে এবং ইসরাঈলিরা আত্মরক্ষামূলক ভূমিকায় যেতে বাধ্য হয়।